ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 17. Number 01. May 2022

প্রাক-সক্রেটিস যুগের সোফিস্ট ও হাল আমলের বিশেষ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্যঃ একটি সক্রেটীয় পর্যালোচনা

আসাদুজ্জামান*

Abstract: In recent times, we notice the regular presence of a special community known as the intellectual community on radio-television talk shows, in newspaper column writing, in various meetings-seminars and in social media.These popular scholars of recent times have been harassing their opponents in various programs by putting their opponents into the logic trap, sometimes defending themselves by razor-sharp writing in newspapers, while many of them as a motivational speakers are advising the young society about achieving success.But we had the first encounter with this view in the history of philosophy about two and a half thousand years ago in the Sophist community—a group of sophist scholars of the pre-Socrates era.The study shows that although there is a huge gap between the pre-Socratic era of the Sophist community and the recent special class of intellectuals in terms of time, but both seem to be similar in terms of thought and conscience. Basically, the purpose of this article is to establish a similarity between the intellectual community of the two eras of the vast gap in history and to make a review according to Socrates' point of view. This article is a basic one and it is a theoretical study.The article has been chosen using the researcher's mental aspect.

মূলশব্দঃ সোফিস্ট, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

ভূমিকা

গ্রীক দর্শনে প্রাক সোফিস্ট যুগের থেলিস থেকে এনাক্সাগোরাস পর্যন্ত প্রায় সকল দার্শনিকের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু ছিল বাহ্য প্রকৃতি। এই বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা থেকে বের হয়ে মানব জীবনের ব্যবহারিক সমস্যার আলোচনায় আগ্রহী হয়ে উঠে গ্রীসের একদল কূটতার্কিক পণ্ডিতের দল। তখনকার প্রাক-সক্রেটিস যুগে এই সম্প্রদায় নিজেদের পেশাদারী শিক্ষক হিসেবে জাহির করেছিল যারা সোফিস্ট হিসেবে পরিচিত।[১] প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের দ্বারা আত্মাকে উন্নত করার বদলে তারা অর্থের বিনিময়ে ব্যক্তি মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করতো। নিজেদের উৎকৃষ্ট নাগরিক হিসেবে গড়ার বাসনায়, সাফল্য লাভের শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে, বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা অর্জনের তাড়নায়, প্রতিপক্ষকে তর্কের জালে ফেলে হারানোর

* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

কৌশল রপ্ত করার জন্য এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য তখনকার গ্রীসিয় সমাজের লোকজন দারস্থ হতো সোফিস্ট সম্প্রদায়ের কাছে। পেশাদারী শিক্ষক হিসেবে তখনকার গ্রীসে তারা অর্থের বিনিময়ে চাহিদা ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান শুরু করেছিল। জ্ঞানের খাতিরে জ্ঞানচর্চা বা সত্য প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে যতটা না প্রাধান্য পেতো তার থেকেও বেশী প্রাধান্য পেতো ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনীয়তা। তা সত্ত্বেও তারাই হয়ে উঠেছিল তখনকার সমাজে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের চাহিদা এতো তুঙ্গে ছিলো যে, সোফিস্ট শিরোমণি প্রোতাগোরাস গর্ব করে বলতেন তার কাছে দীক্ষা নেয়া মানে নিজেকে প্রকৃষ্টতর হিসেবে গড়ে তোলা।[২]

সোফিস্ট শিরোমণি প্রোতাগোরাস ও তাঁর শিষ্যগণ (জর্জিয়াস, হিপ্পিয়াস প্রমুখ) পরলোকে গিয়েছেন প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে তবে হাজার বছর আগে যে ধারা তারা চালু করেছিলেন তা সমকালীন সময়েও প্রাসঙ্গিক হাল আমলের বিশেষ বুদ্ধিজীবীদের প্রেক্ষিতে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে 'মেধাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। "সোফিস্টগণ যে প্রভূত আগ্রহের কারণ হয়ে উঠেছেন তার একটি কারণ হচ্ছে তাঁরা ছিলেন মেধাতন্ত্রের প্রথম প্রবক্তা এবং আমরা যে পাশ্চত্য সমাজে বাস করি তা নামত এবং ব্যবহারিকভাবেও মেধাতন্ত্র"।[৩] সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায়ের অনেকেই নিয়মিত রেডিও-টেলিভিশনে টকশো প্রোগ্রামে প্রতিপক্ষকে তর্কের জালে ফেলে পরাজিত করছে বা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে, কেউ আবার অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্যের মাধ্যমে জীবনে সফল হওয়ার মন্ত্র দীক্ষা দিচ্ছেন, অনেকেই নানা সমস্যার সমাধানে পত্র-পত্রিকায় লিখছেন কলামের পর কলাম। এদের কার্যক্রম গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় এদের লেখনীর বা বাচনের পেছনে সত্য প্রকাশের থেকে বরং অর্থকে প্রাধান্য দেয়া বা বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ গোষ্ঠীকে সমর্থন করে সুবিধা নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। সত্য প্রতিষ্ঠার বদলে যারা তর্কে জেতাকে প্রাধান্য দেয়, সার্বিক প্রয়োজনীয়তার বদলে যারা বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেয়, তরুণ সমাজকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখানোর বদলে কেবল সফলতা লাভের দীক্ষা দেয় তারাই হচ্ছে সোফিস্ট সম্প্রদায়ের এ যুগের প্রতিনিধি। এ প্রবন্ধে আমাদের সাম্প্রতিক কালের জনপ্রিয় এই বিশেষজ্ঞগণ তথা বুদ্ধিজীবী মহল যে প্রাক সক্রেটিস যুগের সোফিস্টদের নবরূপ তা তুলে ধরার এবং জ্ঞানগুরু সক্রেটিস অনুসরণে একটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো। সে লক্ষ্যে আলোচ্য প্রবন্ধে উভয় সম্প্রদায়ের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও শিক্ষাদানের বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কাউকে ব্যক্তিগতভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু প্রবন্ধটির আলোচনা সক্রেটিসকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়েছে সেহেতু আপাতভাবে মনে হতে পারে প্রবন্ধকার আমাদের সাম্প্রতিক কালের বিশেষ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন তবে পুরো প্রবন্ধটি পাঠে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচয়গত সাদৃশ্য

প্লেটো রচিত 'প্রোতাগোরাস', 'গর্জিয়াস', 'ক্রাতিলাস', 'বড় হিপ্পিয়াস', 'ছোট হিপ্পিয়াস' ও 'সফিস্ট'- গ্রন্থগুলো পাঠে আমরা সোফিস্ট সম্পর্কে সদর্থক ও নেতিবাচক উভয় ধারণাই পাই।

শাব্দিক অর্থে সোফিস্ট এর মানে জ্ঞানী। ধ্রুপদী গ্রিক সমাজে তাঁরা প্রাজ্ঞ হিসেবেই বিবেচিত ছিলেন, যাঁদের সংক্ষিপ্ত প্রাজ্ঞবাণী তাঁদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিখ্যাত করেছিল তাঁদের সদর্থে সোফিস্ট বলে অভিহিত করা হতো।

তবে সক্রেটিসের জীবৎকালে শব্দটি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে; এই শ্রেণি সম্পর্কে সক্রেটিস বলেন,

> "যারা পেশাজীবী শিক্ষাদাতা হিসেবে দর্শনীর বিনিময়ে উঠতি বয়সের ছেলেপিলেদের শিক্ষাদান করতেন এবং জন সমক্ষে বাক্যবাগীশতার দক্ষতা উপস্থাপন করতেন তারাই সোফিস্ট"।[৪]
>
> আবার মেমোরেবিলিয়া-তে সক্রেটিস জেনোফোন এর কাছে বলেন যে, "যারাই চায়, তাদের কাছেই যারা অর্থের বিনিময়ে প্রজ্ঞা বিক্রি করে তাদেরই বলা হয় সোফিস্ট"।[৫]

মূলত সোফিস্টরা ছিল পেশাজীবী পরিব্রাজনশীল শিক্ষক, যারা শিক্ষা দানের বিনিময়ে উঁচু হারে দর্শনী গ্রহণ করতো। কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ শিক্ষা না দিয়ে চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন প্রায়োগিক তত্ত্ব সরবরাহ করতো বলে তাঁদের জ্ঞান ব্যবসায়ী বলা হয়ে থাকে।[৬]

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যৎ পাই যারা তাদের বুদ্ধি বা জ্ঞানকে ব্যবহার করে অর্থের জন্য বা বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক আবুল কাশেম ফজলুল হক সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীন চিন্তার চর্চা নেই। আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবীরা কেবল অর্থবিত্ত আর ক্ষমতার ধান্দায় লিপ্ত থাকেন"।[৭] এই শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিবণিক বা জ্ঞান ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। আজকাল অনেক কলামিস্ট ও টকশো বিশেষজ্ঞদের দেখা যায় অর্থের বিনিময়ে পক্ষাবলম্বনীয় লেখা লিখতে বা কথা বলতে। আবার অনেকেই অর্থ হয়তো নেন না কিন্তু যা বলেন বা লিখেন তার নেপথ্যে থাকে কাঙ্খিত পদ লাভ বা বিশেষ গোষ্ঠীর প্রাধান্য।[৮] সত্য প্রকাশ এর বদলে স্বার্থভিত্তিক লেখা বা বলার জন্য এদের 'পেইড বুদ্ধিজীবী' বা 'ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী' বলা হয়ে থাকে।[৯] এ ধরনের বুদ্ধিজীবী মূলত হয় রাষ্ট্রযন্ত্রের নতুবা বিরোধি পক্ষের হয়ে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী হিসেবে রাষ্ট্রের সকল পদক্ষেপের পক্ষে বা রাষ্ট্রীর পদক্ষেপের বিপক্ষে সভা, সেমিনার ও টেলিভিশনের টকশোতে ওকালতি করতে যান। আবার অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তারা তো আজকাল প্রকাশ্যেই অর্থের বিনিময়ে তরুণদের সাফল্য লাভের উপায় শিক্ষা দিচ্ছেন। এদের চিন্তাধারা পর্যবেক্ষণে মনে হয় এরাই যেন সোফিস্টদের আধুনিক উত্তরসূরি।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য

নবীন যুবকদের ক্ষেত্রে ভাড়াটে শিকারী: প্লেটোর 'সফিস্ট' সংলাপটিতে সোফিস্টদের তরুণদের শিকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যার জন্য তাদের শিল্পের বা দক্ষতার অধিকারী সম্পন্ন হতে হয়। আর সোফিস্টের এই শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে,

> "তাঁর শিল্পকে আত্মসাৎধর্মী অর্জনধর্মী শিল্পের শাখায় চিহ্নিত করা যেতে পারে; এটি প্রাণীদের শিকার করে– জীবন্ত-স্থলজ-পোষা প্রাণী; যা আবার মানুষ শিকার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে; ভাড়ার প্রতিদানে, অর্থ নিয়ে প্রত্যয়ী করে শিকার করা; আর একেই বলা হয় সফিস্টগিরি, আর এটিই হলো সম্পদশালী এবং উচ্চবংশজাত তরুণ শিকার; ...।"[১০]

বর্তমান সময়েও আমরা দেখি একশ্রেণির অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তা রয়েছে যারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে সাফল্য লাভের প্রত্যয় সৃষ্টি করে থাকেন। বর্তমান কালের যে মোটিভেশনাল স্পিকার এরাও মূলত সোফিস্টের মতো বিশেষ শিল্পের অধিকারী যার মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রোতাগোরাসকে যেমন ভাড়া করা হতো তেমনি আজকাল এসব বক্তাদেরও ভাড়া করা হয় তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে।

খুচরা বিক্রেতা হিসেবে সোফিস্ট: প্লেটো তাঁর 'সফিস্ট' সংলাপে দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ ভাগে সোফিস্টকে আত্মার পরিচর্যাকারী শিক্ষার ব্যবসায়ী, আত্মার সামগ্রিক খুচরা বিক্রেতা এবং নিজের তৈরি করা সামগ্রির বিক্রেতা হিসেবে অভিহিত করেন। আত্মার পরিচর্যার জন্য দরকার সদগুণের। প্লেটো সোফিস্টকে সদগুণের কারবারি হিসেবে উল্লেখ করেন। সোফিস্টের শিল্পের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে বিনিময়, বাণিজ্য, ফেরির মাধ্যমে অর্জনধর্মী শিল্পের সূত্র ধরে, আত্মার পণ্যসামগ্রীর বিক্রিবাট্টায়, যার কায়-কারবার সদগুণের বাচন ও জ্ঞান নিয়ে।'[১১]

কিভাবে সদগুণ অর্জন করা যায় অর্থাৎ কিভাবে উৎকৃষ্ট নাগরিক হওয়া যায় তা শিক্ষাদানের জন্য আজকাল নানা সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যাতে বিভিন্ন বক্তারা অর্থের বিনিময়ে সদগুণ অর্জনের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আবার পত্র-পত্রিকাতেও সদগুণ অর্জনের প্রক্রিয়া নিয়ে কলাম লেখা হচ্ছে। সদগুণকে যেন পণ্য মনে করে আজকালকার বুদ্ধিবণিকেরা একে ফেরি করে চলছেন সেই সোফিস্টদের মতোই।

কূটতার্কিক/বাগ্‌বিতণ্ডা-শিল্পের অধিকারী: সোফিস্টের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্য হলো কূটতার্কিকতা। 'যা শিল্পের রীতিনীতি মেনে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ন্যায় ও অন্যায় আর সাধারণভাবে জিনিসপত্র নিয়ে বাদানুবাদে এগিয়ে যায়, তাঁকে আমরা বাগ্‌বিতণ্ডা বিশারদ বা কূটতার্কিক বলি'।[১২] কূটতর্কে জয়লাভই হলো সোফিস্টের লক্ষ্য। কিন্তু দার্শনিক জয়লাভের লক্ষ্যে কোনো আলোচনা, সংলাপে প্রবৃত্ত হন না; তাঁর লক্ষ্য হলো সত্য লাভ।

আধুনিক টকশো প্রোগ্রামে আমরা দেখি বিশেষজ্ঞদের অন্যতম উদ্দেশ্যই থাকে কূটতর্কের জালে ফেলে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। এসব বিশেষজ্ঞদের সত্য প্রতিষ্ঠায় যতটা না আগ্রহ থাকে তার থেকে বেশি প্রচেষ্টা থাকে কেবল নিজের মতকে সঠিক প্রমাণ করা। আর বাগ্‌বিতণ্ডা শিল্পের অধিকারী এসব বুদ্ধিজীবী এটা করতে গিয়ে অনেকেই মিথ্যাকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতেও তর্ক করতে ছাড়েন না।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও খণ্ডন পদ্ধতির অনুসরণকারী: একটি মাত্রায় সোফিস্টের কার্যপদ্ধতি প্লেটোর অনুমোদন লাভ করে, আর তা হলো তাঁর বিশোধক পদ্ধতি। তাঁরা খণ্ডন পদ্ধতির বাস্তবায়ন ঘটিয়ে মানুষজনের উপকার করেন। এটি দার্শনিকেরও পদ্ধতি। একজন মানুষ যখন কোনো একটি জিনিসকে জানে না কিন্তু ধরে নেয় যে, সে তা জানে, তাই বুদ্ধিবৃত্তির ভ্রান্তির সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এই অজ্ঞতা দূরীকরণে বিশোধক পদ্ধতি কার্যকর।[১৩] সক্রেটিসের এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো প্রথমে অন্যের মতকে সাদরে গ্রহণ করা। ফলে সক্রেটিস তাঁর পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষের মত স্বীকার করতেন। কিন্তু পরে যৌক্তিক উপায়ে স্বীকার করা মতকে খণ্ডন করে সত্যকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন।

আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন যারা কারও কোন ভুল সংশোধনের জন্য এই খণ্ডন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। অনেক টকশোবিদ টকশো টেবিলে প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন এবং যথাযথ খণ্ডনের মাধ্যমে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে টকশো প্রোগ্রামে প্রশ্ন ও খণ্ডনের মাধ্যমেও একশ্রেণির বিশেষজ্ঞগণ প্রতিপক্ষের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে টকশো প্রোগ্রামগুলোতে প্রশ্নের মাধ্যমে খণ্ডন করে সমাধান দিতে পারলেই তা স্থায়ী হয়।

প্রতিচ্ছবি সৃষ্টিকারী/অবভাস নির্মাতা: সোফিস্টের আরেকটি বৈশিষ্ট্যে ধরা পরে, সোফিস্টরা তাঁর শিক্ষার্থীদের বাস্তবতার জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার বদলে বাস্তবতা নয় বরং বাস্তবতাসদৃশ কিছুর অবভাস শিক্ষা দেন।

> 'নব্যযুবকেরা যখন জিনিসপত্রের বাস্তবতা থেকে একটি দূরত্বে অবস্থিত থাকে, তখন তাদের সামনে কাল্পনিক তর্কযুক্তির খেলা খেলে, তাদের তা সত্য বলে মনে করিয়ে, যুক্তিতর্কের বক্তা হিসেবে তাদের নিজেদের সবচেয়ে জ্ঞানী বলে ভাবিয়ে, আর এসব কথাবার্তা তাদের কানে পশিয়ে, তাদের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করে সফিস্টগণ তাদের জ্ঞান ব্যবসা পরিচালনা করেন; কিন্তু "যখন দিন যাওয়ার সাথে সাথে এই শ্রোতাদের বয়স বাড়তে থাকে, তারা অধিকতর হারে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে থাকে, বেদনাময় অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্রের সত্যতা দেখতে পায়, তা অনুভব করে, তখন... অধিকাংশ যুবকই তাদের পূর্ব-পোষিত অভিমত (বিশ্বাস) বদলে ফেলতে বাধ্য হয়... তাদের কাছে অধিকতর বড় জিনিস কেবল ছোটই মনে হয় না, সহজ জিনিস কঠিন মনে হয়...তাদের স্বপ্ন কল্পনা জীবনের রূঢ় বাস্তবতার নিগঢ়ে পড়ে পাল্টে যায়।"[১৪]

ইদানিং আমাদের একশ্রেণির অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তাদের দেখি তরুণদের সাফল্য লাভের মন্ত্র শেখানোর জন্য নানা আয়োজনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এদের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণরা বিশাল এক কল্পনার রাজ্যে বাস করে। কিন্তু কিছুকাল পার হওয়ার পর এসব তরুণ যখন বাস্তবতার সম্মুখীন হয় তখন তারা তাদের সম্পর্কে পূর্বের ধারণা পাল্টে ফেলতে বাধ্য হয়। নিজের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা না থাকার ফলে কেবল অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্যের মাধ্যমে যারা কিছুকাল পূর্বেও রঙ্গিন স্বপ্ন দেখেছিল তারাই আরও হতাশ হয়। এভাবে এই সম্প্রদায়ও তরুণদের প্রকৃত শিক্ষা না দিয়ে সোফিস্টদের মতো কেবল অবভাসিক শিক্ষাটাই দিয়ে থাকেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাদৃশ্য

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের লক্ষ্য ছিল জগৎ সম্পর্কে বস্তুগত সত্য আবিষ্কার করা। অপরপক্ষে, সোফিস্টরা বস্তুগত সত্য প্রতিষ্ঠায় তেমন আগ্রহী ছিল না, তাদের লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক, মননমূলক নয়। সত্য নির্ধারণ করা সোফিস্টদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে, যা তারা বিশ্বাস করাতে চায়, তাই বিশ্বাস করানো। কাজেই সোফিস্টরাও, মামলার উকীলের মত, সত্যতা নির্ধারণের চেষ্টা না করে, কিভাবে কতকগুলি যুক্তির সাহায্যে একটা বচনকে প্রমাণ করা যায় সেদিকেই তাদের সমস্ত উৎসাহ ও প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করতো।

যুক্তির সাহায্যে কালোকে সাদা, বা ভালোকে মন্দ প্রমাণ করা যেতে পারে বলে তারা অহংকার করতো।[১৫]

'সত্য' আর 'প্রকৃষ্টতার' মধ্যে পার্থক্য করেন সফিস্ট শিরোমণি প্রোতাগোরাস। তাঁর লক্ষ্য সত্য প্রতিষ্ঠা নয়, তথা জ্ঞানও নয়, বরং যা প্রকৃষ্টতর সেই বাস্তবতা সৃষ্টি। প্রোতাগোরাস বলেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রেও নিকৃষ্টতম অবস্থাকে প্রকৃষ্টতম অবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় প্রতর্কের মাধ্যমে; যেমনিভাবে চিকিৎসকরা ঔষুধ দিয়ে পরিবর্তন সাধন করেন'।[১৬]

আবার গর্জিয়াস প্রমুখ খ্যাতনামা সোফিস্ট, বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও যেকোনো সময়ে যেকোনো আলোচনায় উদ্যত হতেন। কাজেই সোফিস্টদের কাছে জয়ের লক্ষ্যটাই ছিল বড় আর তর্ক, তা কূটতর্কই হোক না কেন, জয়ের জন্য তাকে প্রয়োগ করতে সোফিস্টরা দ্বিধা করত না। সোফিস্টরা বিরোধী পক্ষকে তর্কের জালে জড়িয়ে নাস্তানাবুদ করতে ইতস্তত করত না। প্রয়োজন হলে হৈ-চৈ করে, গোলমাল করে, হিংসার আশ্রয় নিয়ে হলেও তারা কার্যসিদ্ধি করত।[১৭]

আমাদের বর্তমান সময়ের চাহিদা সম্পন্ন টকশো বিশেষজ্ঞ যেন সোফিস্টের সুযোগ্য উত্তরসূরি। তর্কের মাধ্যমে নিজেদের জেতাতে সোফিস্ট সম্প্রদায় যেমন কালোকে সাদা প্রমাণ করতেও দ্বিধা করতে না, তেমনি এরাও ইতিহাসের অকাট্য দলিলের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতেও দ্বিধা করে না। সত্যের পক্ষ নেয়া নয় বরং কূটতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে টকশো টেবিলে পরাস্ত করাটাই তাদের মূল লক্ষ্য। মূলত এরা নিজেরা যা বিশ্বাস করে বা তাদের যা বিশ্বাস করাতে বলা হয় তার স্বপক্ষেই তাঁদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে দেখা যায়। প্রকৃত সত্য উৎঘাটনের বদলে তাঁদের লক্ষ্য থাকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুবিধা নেওয়া। গর্জিয়াসের মতো আমাদের একশ্রেনির বুদ্ধিজীবী আছেন যারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকার পরও দিব্যি অতিথি হিসাবে টকশো টেবিল মাতিয়ে বেড়াচ্ছেন বা পত্রিকায় লিখে চলছেন। কূটতর্কের মাধ্যমে জেতার নেশায় এরা এতটাই মত্ত থাকে যে, টকশোতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে গিয়ে কথা কাটাকাটির পাশাপাশি হৈ-হুল্লোড় এমনকি চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি পর্যন্ত করে। দেখা যায় এমনও হয় বাধ্য হয়ে উপস্থাপক টকশো প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেন। আমাদের সুবিধাবাদি কলামিস্টদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যই থাকে যে বিষয়ে লেখার জন্য তাকে সুবিধা দেওয়া হয় কেবল সে বিষয়টির পক্ষেই কলম ধরবেন। আবার আমাদের অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তাদের লক্ষ্যই থাকে প্রত্যয় সৃষ্টি করা; তা স্থায়ী হোক আর না হোক তাতে তাদের কোন লক্ষ্য থাকে না। মূলত তারা নিজেরা যা বিশ্বাস করে বা তাদের যা বিশ্বাস করাতে বলা হয় তার স্বপক্ষেই কেবল তারা প্রত্যয় সৃষ্টি করে থাকে।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দিক থেকে সাদৃশ্য

সোফিস্ট ও সক্রেটিস উভয়ই শিক্ষা প্রদানে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অবলম্বন করলেও, এ ব্যাপারে সক্রেটিসের পদ্ধতির সাথে সোফিস্টদের পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সোফিস্টদের পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো সত্য আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য না রেখে যে কোন মতে যুক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে জয়লাভ করা। সোফিস্টরা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করতো তাতে তাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার দোষ প্রদর্শন করা এবং এটা তারা করতো

শব্দের অর্থের দ্ব্যর্থকতার উপর মনোনিবেশ করে। তারা উত্তরদানকারীকে নিজের পছন্দমতো উত্তরদান করতে দিত না। এই পদ্ধতিতে প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য হলো প্রতিপক্ষকে পরস্পর বিরোধিতার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলা। আর প্রতিপক্ষের লক্ষ্য হবে, যে কোনভাবে এই ফাঁদকে এড়িয়ে চলা, তার প্রদত্ত উত্তর যা সে বিশ্বাস করে, তাকে প্রকাশ করুক বা না করুক। অপরপক্ষে সক্রেটিস তাঁর অনুসৃত পদ্ধতির ক্ষেত্রে যাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন তা হল যে, প্রতিপক্ষ যদি কোন বচনকে বিশ্বাসযোগ্য মনে না করে তাহলে সে যেন কোনভাবেই তাতে স্বীকৃতি না দেয়। তাঁর মতে, শুধুমাত্র অসঙ্গতিকে এড়াবার জন্য যদি কোন বচনে স্বীকৃতি জানান হয়, যাতে প্রতিপক্ষের বিশ্বাস নেই, তাহলে সেটা হবে যা সত্য তাকে প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা তার ধ্বংসসাধন করা। সক্রেটিস তাঁর পদ্ধতিতে প্রথমে প্রশ্ন করতেন। এর মাধ্যমে তিনি কোন বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করতেন। প্রশ্নের এবং তর্কের মাধ্যমে উত্তরদাতার কাছ থেকে তিনি কোন বিষয়ের সত্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করতেন। এভাবে; উত্তরদাতা নিজেই সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারতেন।

সোফিস্টদের দর্শনের মূল ভাবধারা সেই দর্শনের প্রধান নায়ক প্রোতাগোরাসের আপ্ত বাক্য "মানুষই সব কিছুর পরিমাপক"-এর মধ্যেই নিহিত। তাঁদের মতে জ্ঞান ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। এই ইন্দ্রিয় অনুভূতি ব্যক্তি ও সময় ভেদে ভিন্ন হতে পারে। এমনকি তা একই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পারে। জ্ঞানের মতো সত্যতা, ন্যায়-নীতি, আদর্শ সবকিছুই ব্যক্তিগত অভিরূপি অভিজ্ঞতা তথা আত্মগত মূল্যায়নের ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের মতে, এমন কোন জ্ঞান নেই যা সবার জন্য সুনিশ্চিত, এমন কোন নীতি বা আদর্শ নেই যা সবার জন্য শ্রেয়। সোফিস্টদের মতে, প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ মানুষই জ্ঞান, নীতি, আদর্শ ইত্যাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ পৃথক মানদণ্ড প্রণয়নে সমর্থ এবং সে অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান, সত্য, নীতি ও আদর্শ গৃহীত হয়। প্রোতাগোরাস তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন বিপরীতধর্মী তত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, একই বিষয় একজনের কাছে যা সত্য অন্যজনের কাছে তা মিথ্যা হতে পারে। এই বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি;

"What is true to me, is true for me, what is true to you, is true for you"[১৮]

আমাদের হাল আমলের টকশো বিশেষজ্ঞদেরও দেখা যায় এরা প্রতিপক্ষকে তাদের পছন্দমতো উত্তর করতে দেন না। অনেক সময়ই দেখা যায় বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না করে বরং বাকচাতুর্যতার বলে তারা এটা প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠে যে, প্রতিপক্ষ পরস্পর বিরোধী কথা বলছে। আর তখন তারা তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে নিজেকে জয়ী মনে করে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন না যে, কূটতর্কের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে হয়তো ধরাশায়ী করা যায় কিন্তু তাতে তার বক্তব্য সত্য প্রমাণিত হয়ে যায় না।

রেডিও-টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে ও পত্রিকার কলামে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের প্রায়ই দেখি পরিস্থিতি অনুযায়ী পক্ষাবলম্বন করে থাকেন এবং সেটার উপরই কূটতর্ক চালিয়ে যেতে থাকেন। এই শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মত বা পরস্পর বিরোধী বক্তব্যও প্রদান করতে দেখি। এমনকি তারা নিজেরা যা বিশ্বাস করে সময়ের পরিবর্তনে তাদের নিজের

অবস্থানেও তারা থাকছেন না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে নিজের মত পরিবর্তন যখন করেন আবার অনুসারীদের যখন সময় এবং অবস্থা বিবেচনায় পক্ষাবলম্বন শেখান তখন আমরা বলতে পারি সোফিস্টের মতো তাদেরও কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ নেই।

শিক্ষাদানের বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য

সোফিস্ট শিরোমণি প্রোতাগোরাস বলেন, কেউ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিলে প্রকৃষ্ট থেকে প্রকৃষ্টতর অবস্থায় পরিণত হবে। একজন শিক্ষার্থী তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিলে প্রতিনিয়তই তার উৎকৃষ্টতম অবস্থায় উত্তরণ ঘটবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।[১৯]

প্রোতাগোরাস আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলেন, তিনি যা শেখান তা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দের যোগ্য বিদ্যার্জন, যাতে একজন সবচেয়ে সুচারুরূপে তার গৃহস্থালির ব্যবস্থা করতে পারে, এবং সেইসাথে রাষ্ট্রের দাবিকৃত কার্যাদিও সম্পন্ন করতে পারে; নগরীতে যাতে একজন বক্তা হিসেবে, আবার কর্মযজ্ঞের হোতা হিসেবেও সত্যিকারের ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে পারে।[২০] অর্থাৎ সোফিস্টগণ উচ্চহারে দর্শনীর বিনিময়ে প্রাচীন গ্রিসে বাগ্মিতা, সদগুণ ও রাষ্ট্রীয় ও সাংসারিক কর্ম সম্পাদনের শিক্ষা দিতেন। তাঁর বিপরীতে সক্রেটিসের মতো দার্শনিকমনে করতেন যে, সোফিস্টগণ যা শিক্ষা দেন, তা নিছক দক্ষতা, তা আদত শিক্ষা নয়, তা মানুষকে সত্যিকার জ্ঞানী করে না. নৈতিকভাবে উন্নত করে না।

প্রোতাগোরাসই সর্ব-প্রথমে দাবি করেছিলেন, সকল বিষয়েই দুইটি পরস্পরবিরোধী তর্কযুক্তি আছে। বিপরীতধর্মী দুই অবস্থানের মধ্যে সুবিধামতো যেকোন অবস্থানে অবস্থান করার জন্য তিনি তার ছাত্রদের বাগ্মিতায়, কূটতর্কে, ভাষার ব্যবহারে, সুযোগ্য সময়ে যুক্তির উপস্থাপনে প্রশিক্ষিত করতেন। সোফিস্টদের শিক্ষণীয় বিষয় বাগ্মীতা সম্পর্কে সক্রেটিসের প্রশ্নের মুখে গর্জিয়াস বলেন যে, 'যে শিল্প বক্তৃতার মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জন করে তা হলো বাগ্মিতা' আর তা করা হয় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা দর্শকদের মধ্যে প্রত্যয় উৎপাদনের মাধ্যমে। এই প্রত্যয় উৎপাদনের দক্ষতাই হলো বাগ্মিতার দক্ষতা, আর তাই তার মূল কাজ।[২১] অন্যতম সফিস্ট গর্জিয়াস মনে করতেন, বাগ্মী কেবল কলা কৌশল আয়ত্ত করে জিততে চাইবে বা প্রত্যয় অজ্ঞদের মাঝে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে চাইবে। বাগ্মীকে ন্যায়, অন্যায়, সত্যতা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলেও চলবে। বাগ্মী কেবল উপদেশ দিয়ে বিশাল জনগনকে বা দর্শকদের প্রত্যয় উৎপাদন করে লক্ষ্য অর্জন করবে।[২২]

রেডিও-টেলিভিশনের টকশো প্রোগ্রাম ও নানা অনুপ্রেরণাদায়ী সেমিনার লক্ষ্য করলে বুঝা যায় এসব অনুষ্ঠানের টকশো বিশেষজ্ঞ ও অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তা এই দুইশ্রেণির বুদ্ধিজীবী বাগ্মিতার কলা-কৌশলের মাধ্যমে টকশোতে জয় লাভ করছেন আর তরুণদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরী করছেন সাফল্য লাভের কিন্তু উপেক্ষা করছেন ন্যায়-অন্যায়, সত্যতা, আদর্শকে। বস্তুত, যে কূটচালে বা বক্তব্যে সত্য প্রতিষ্ঠার বদলে মিথ্যাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় বা কেবল সাফল্য লাভের শিক্ষা দেয়া হয় তা লজ্জাস্কর বৈ কিছু নয়। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এসব কূটতার্কিকতা দেখে কাকে কিভাবে জব্দ করতে হয় কেবল তাই শিখতে পারবে। আবার শুধুমাত্র শুদ্ধ ভাষায় চাপাবাজি করতে পারলেই আজকাল অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তা হওয়া যায় এবং রেডিও টেলিভিশনে টকশো প্রোগ্রামে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণও পাওয়া যায়।

সোফিস্টরা সততাকে শিক্ষণীয় মনে করে তারা এর শিক্ষক দাবি করেছিল। তাদের কাছে সততা বলতে বোঝাত রাষ্ট্র এবং পরিবারকে যথাযথভাবে চালিত করার কলাকৌশল বা দক্ষতা। একজন মানুষকে অধিকতর উৎকৃষ্ট নাগরিক বানানোর অঙ্গীকার এক কথায় সদগুণ শিক্ষাদান। অর্থের বিনিময়ে তারা নাগরিকদের সদগুণের শিক্ষা দিতো। অথচ প্রকৃত সততার সাথে জ্ঞানের রয়েছে অনিবার্য সম্পর্ক আর সোফিস্টরা তাকেই করেছেন অগ্রাহ্য।[২৩]

আমাদের বর্তমান সমাজেও আমরা দেখি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি যথাযথ সম্পাদন করাটাই সততা বলে বিবেচ্য। পত্রিকার কলামে এবং নানা আয়োজনে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে নাগরিকদের উৎকৃষ্ট নাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেন। মূলত নানান আয়োজনের মাধ্যমে সদগুণ বলতে যা শেখানো হয় তা হচ্ছে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় কাজগুলো পালনের কলা-কৌশল মাত্র। সোফিষ্টদের মতো আমাদের আধুনিক এই বুদ্ধিবণিক শ্রেণিও অর্থের বিনিময়ে ভালো নাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেন।

পর্যালোচনা

সোফিস্ট সম্প্রদায় ও আমাদের বিশেষ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় দুই যুগেই বেশ প্রভাবশালী শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদানের জন্য। তবে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদানের জন্য অর্থ গ্রহণ করার রীতি খারাপ না হলেও সোফিস্টেদের পূর্বে এই রীতির প্রচলন ছিল না। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও সক্রেটিস এই জাতীয় রীতিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তাঁদের মতে, প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ ভেতরকার অজ্ঞতা দূরীভূত করে প্রকৃত সত্য শেখাতে পেরে আত্মিক তৃপ্তি অনুভব করে থাকেন।

তথাপি তৎকালীন গ্রীক বিশ্বে সোফিস্ট সমাজ প্রভূত প্রভাবশালী ছিল বলেই দলে দলে নাগরিকরা তাদের কাছে শিক্ষাগ্রহণে দারস্থ হতো। তেমনি আমাদের বিশেষ শ্রেণির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের চাহিদা তুঙ্গে বলেই এরা বিভিন্নভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা লাভের পদ্ধতি লক্ষ্য করলে সোফিস্টদের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে তেমন নেতিবাচক মনে হয় না। শিক্ষার প্রধান ধারাটিই হাল আমলে অর্থনৈতিক নিয়ম বা সুবিধাবাদিতার ধারায় চলছে। সোফিস্টগণ ছিলেন তার মূল প্রবক্তা। সোফিস্টের দেখানো পথেই হাল আমলের টকশোবিদ, কলামিষ্ট ও অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তাগণ চলছেন।

আমরা দেখেছি প্রাক সোফিস্ট আর হাল আমলের একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় উভয়ের লক্ষ্যই যেন, যে কোন উপায়ে কূটতর্কে জেতা বা নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সক্রেটিসের মতে, দার্শনিক জয়লাভের লক্ষ্যে কোন আলোচনা, সংলাপে প্রবৃত্ত হন না; তাঁর লক্ষ্য হলো সত্যলাভ। প্লেটো তাঁর 'সফিস্ট'- গ্রন্থে বলেন,

> 'যে অভ্যাস কেবল আলাপ চারিতায় সুখলাভের খাতিরে নিজের কাজকর্ম অবহেলার কারণ হয়, আর যার স্টাইল কোনো ক্রমেই সংখ্যা-গরিষ্ঠ শ্রোতার কাছে সুখকর নয়, তাকে যথাযর্থই বাচালতা বলা যেতে পারে'।[২৪]

সোফিস্ট সম্প্রদায় ও আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কূটতর্কে জেতার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে বাগ্মিতা। বাগ্মিতা সম্পর্কে সক্রেটিস বলেন, 'দুই ধরনের বাগ্মিতা আছে, তাদের মধ্যে এক

ধরনের বাগ্মিতা, আমার ধারণা, তোষামোদ এবং লজ্জাকর বক্তৃতাবাজি; অন্যটি কেবলই শুদ্ধ; দ্বিতীয়টি চেষ্টা করে নাগরিকদের আত্মাকে সম্ভবপর স্বাস্থ্যকর করে তুলতে এবং সবসময় প্রচেষ্টা চালায় যা সবচেয়ে প্রকৃষ্ট তা বলতে তা দর্শকের কানে মধুর লাগুক বা নাই লাগুক তাতে তাদের কিছু যায় আসে না' সেই শুদ্ধ বাগ্মিতার ব্যবহার ঘটানোর উদ্দেশ্যে সক্রেটিস বলেন যে, 'কেউ কোনো অন্যায় করলে একজন মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত নিজেকে বা তার পুত্রকে, বা তার বন্ধুকে অভিযুক্ত করার জন্য; আর সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেরই বাগ্মিতার ব্যবহার ঘটানো উচিত।'[২৫]

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের টকশো টেবিলে এবং পত্রিকার কলামে আমরা যখন পক্ষপাতমূলক তোষামোদে লেখা ও লজ্জাস্কর দলবাজি দেখতে পাই তখন তাদের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হই। এখন অবস্থা এমন যে, টকশো প্রোগ্রামে বা কোন সভা-সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথির চেহারা এবং পত্রিকার কলামের লেখকের নাম দেখলেই অনায়াসে বলে দেওয়া যায় তিনি কোন পক্ষের হয়ে কথা বলবেন বা লিখবেন। এইসব বুদ্ধিজীবীদের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান দলীয় মুখপাত্র ও তোষামোদজীবী বলে আখ্যা দেন।[২৬] একজন যথার্থ বুদ্ধিজীবী কখনও তর্কে জেতার জন্য বা বিশেষ সম্প্রদায়কে খুশি করার জন্য সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষে যেতে পারে না। সত্য এবং ন্যায় প্রকাশে একজন যথার্থ বুদ্ধিজীবী দল, মত, বর্ণ, গোষ্ঠী এসব তোয়াক্কা করেন না। অথচ পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে, সভা-সেমিনারে পক্ষপাতদুষ্ট এমন বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎও পাই যারা প্রকৃত সত্যকে জেনেও তা আড়াল করে কেবল সুবিধা প্রাপ্তির খাতিরে মিথ্যার পক্ষে কলম ধরছেন বা গলাবাজি করছেন। সত্য না জানা অজ্ঞতা আর সত্য জেনেও তার পক্ষ না নিয়ে মিথ্যার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো পাপ।

প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা সুবিধা ও ক্ষমতার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকেন না বরং তারা সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধান নিয়ে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন বলেই তারা হয়ে উঠেন জনবান্ধব বুদ্ধিজীবী। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সেরা চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবী দার্শনিক নোয়াম চমস্কি বুদ্ধিজীবীর দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে আরো পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকারের মিথ্যাগুলোকে জনগণের সামনে উন্মোচন করা। তাঁর মতে, বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিভিত্তিক চিন্তা ভাবনা অনুসরণ করে রাষ্ট্র এবং সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কাজের চুলছেরা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করবেন এবং সেসব নিয়ে কথা বলবেন তারা জনগণের পক্ষে থেকে সত্য অনুসন্ধান করবেন এবং তা জনগণের সামনে প্রকাশ করবেন"।[২৭]

বাগ্মিতার বলে বা তর্কের জালে ফেলে সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না। একজন যথার্থ বাগ্মির লক্ষ্য হওয়া উচিত সত্যকে আপন মহিমায় ভাস্বর হতে সাহায্য করা। প্রতিটা ঘটনা বা বিষয়ের তিনটি দিক থাকে; একটা পক্ষের দিক, আরেকটা বিপক্ষের দিক, আর তৃতীয়টি হচ্ছে মূল ঘটনা বা বিষয় অর্থাৎ সত্যের দিক (নিরপেক্ষ) যা বের করাই যথার্থ বুদ্ধিজীবীর কাজ। আসলে, বাগ্মীতা সহজাতভাবে মন্দ নয়; কেবল ব্যবহারের কারণে তা উত্তম বা মন্দ হয়ে উঠে। প্লেটো পরবর্তীতে তাঁর 'ফিদ্রাস'- গ্রন্থে বাগ্মীতা নিয়ে তাঁর ধারণা পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন, উত্তম ও সত্যিকার বাগ্মী হতে হলে একজন মানুষের সহজাত ক্ষমতা, জ্ঞান ও অনুশীলন দরকার। কেবল বাগ্মিতার বলে 'দুর্বল যুক্তিকে শক্তিশালী যুক্তি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা

করার যে ধারা সোফিস্টরা রচনা করেছিলেন, তাই আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অনেক সময় যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরাও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকা সত্ত্বেও কেবল বাগ্মীতার অধিকারী না হওয়ার দরুন প্রকৃত সত্যটাও সে তুলে ধরতে পারেন না।

যিনি তার বাচনে ও লেখনীতে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিতকে প্রাধান্য না দিয়ে অর্থকে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলকে প্রাধান্য দেন তাকে বুদ্ধিজীবী না বলে সুবিধাবাদি বলাই শ্রেয়। আহমদ ছফার মতে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা সুবিধাবাদি। তারা নিজেদের আখের গোছাতেই বেশি ব্যস্ত, সমাজের কল্যাণ সাধন তাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে তারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ব্যয় করতে আগ্রহী নন। নিজের স্বার্থের বাহিরে তারা একচুলও নড়েন না।[২৮] স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় বলেই আজকাল বুদ্ধিজীবীদের নামের আগে দলীয় বুদ্ধিজীবী শব্দটি শোনা যাচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক নেহাল করিম তাদের বলেছেন, 'আওয়া-বাওয়া বুদ্ধিজীবী' যার মানে আওয়ামী পন্থী বুদ্ধিজীবী ও বিএনপি পন্থী বুদ্ধিজীবী। তবে তারা আদতে বুদ্ধিজীবী কীনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। তার কথা বুদ্ধিজীবীর প্রথম শর্ত হলো তিনি স্বাধীন চিন্তা করবেন। মানুষের পক্ষে কথা বলবেন। নিজের স্বার্থ চিন্তা করবেন না। তিনি বলেন, "এখন পাওয়া যায় 'পদক বুদ্ধিজীবী' যারা সরকারের কাছ থেকে নানা ধরনের পদক পান। তারা বুদ্ধি বেচে জীবিকা নির্বাহ করেন।"[২৯] অথচ একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবী ন্যায় সত্যের পক্ষে আমৃত্যু লড়ে যান তার কোন দলের প্রতি বা অর্থের প্রতি মোহ থাকে না। একজন বুদ্ধিজীবী যখন অর্থের মোহ কাটিয়ে, দলের আনুগত্য ত্যাগ করে, ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে চেতনার মেরুদন্ড শক্ত করে সত্য, ন্যায়, মঙ্গল ও আদর্শের জন্য পত্রিকায় কলামে লিখতে পারেন, বিভিন্ন প্রোগ্রামে বলতে পারেন তখনই তিনি প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠেন।

প্রাক সোফিস্ট ও হাল আমলের একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বাগ্মীতার দক্ষতাবলে বিশাল জনগোষ্ঠীকে উদ্দীপ্ত বা প্রত্যয় উৎপাদন ও মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জন্মানোর কাজটি করে থাকেন। গর্জিয়াস বলেন "বাগ্মিতা ঠিক বা বেঠিক সম্পর্কে এমন প্রত্যয়ের জন্ম দেয় যা শিক্ষাদান আর শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপার নয় বরং প্ররোচনা এবং বিশ্বাসের ব্যাপার"।[৩০] তার বিপরীতে সক্রেটিস বলেন, মিথ্যা প্রত্যয় সৃষ্টি না করে দার্শনিক চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীকে বাস্তবতার অনুসন্ধানকারী যতটা সম্ভব বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসার যাতে তাকে বেদনাময় অভিজ্ঞতা পেতে না হয়। তাই সক্রেটিস হলেন শিক্ষাদানের পক্ষে; তিনি জ্ঞানের পক্ষে, বিশ্বাস বা প্রত্যয় উৎপাদনের পক্ষে নন।[৩১]

বাগ্মীরা যা করেন তা হলো এই দ্বিতীয় ধরনের কাজ। "বাগ্মী জুরিকে বা বিপুল জনতাকে ঠিক এবং বেঠিক সম্পর্কে শিক্ষা দেন না তিনি কেবল উপদেশ দিয়ে প্ররোচিত করেন; আর তাছাড়া এত স্বল্প সময়ে এত বিপুলসংখ্যক জনতাকে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কী-ই বা শিক্ষা দেবেন" বাগ্মীর কাজ দেখে যেন মনে হয়, "কোনো জিনিস সম্পর্কিত সত্যতা নিয়ে বাগ্মীর কোনো জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই; যাতে মনে হয় তিনি বিশেষজ্ঞদের চাইতে বেশী জানেন–অজ্ঞদের মাঝে এমন প্রত্যয় জন্মানোর কৌশল আবিষ্কার করাই তাঁর জন্য যথেষ্ট।"[৩২]

মূলত আমাদের প্রিপেইড অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তাদের আগেই আয়োজক বলে দেন কেবল সাফল্য লাভের শিক্ষার কথা বলে শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করতে হবে। আর আমাদের বক্তারা নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষা করে কেবল সফলতা লাভের শিক্ষাটার কথাই বলে। অনুপ্রেরণাদায়ক বক্তব্য শোনার পর শ্রোতাদের মধ্যে এক ধরনের প্রশান্তির প্রত্যয় বা উদ্দীপনা জন্ম নেয় এই ভেবে যে, তারা বুঝি সাফল্যের সূত্র পেয়ে গেছেন! পুরো পৃথিবীটাকেই যেন তারা এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পায়, যা তার মধ্যে আগে ছিলনা। কিন্তু কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে শ্রোতাদের মনে প্রত্যয়ের হিমালয় গড়ে উঠেছিল, তা যেন বরফের ন্যায় গলে হতাশায় বিষন্নতার দিকে চলে যায়। মূলত আমাদের প্রেরণাদায়ক বক্তাগণ শ্রোতাদের সম্পর্কে আগে থেকে অজ্ঞ থাকার দরুন তার মধ্যে কি ধরনের সম্ভাবনা, জ্ঞান, দক্ষতা আছে সে সম্পর্কে অবগত থাকেন না। অথচ একজন শ্রোতার সফল হওয়ার শিক্ষা নেয়ার জন্য কি ধরনের সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে এটা জানা আগে জরুরী। সেজন্য একজন বক্তাকে প্রথমেই নিশ্চিত করা দরকার তার বক্তব্য শুনে শ্রোতাগণ কোন বিষয়ে উদ্দীপ্ত হতে পারবে। তখন এটা জেনে যে শ্রোতারা বক্তব্য শুনতে যাবেন তাদের ভেতরকার সম্ভাবনাটা ধরে যদি অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তাগণ যথেষ্ঠ সময় নিয়ে কাউকে মোটিভেট করতে পারেন তখন সেটা অন্তরের অন্তস্থল থেকে আসলে তবে ফল লাভের সম্ভাবনা বেশী।

রাষ্ট্র ও পরিবারকে যথাযথ চালিত করার কৌশলকে সোফিস্টরা সততা বলে আখ্যায়িত করতো আর আজকালও যার যা দায়িত্ব তা যথাযথ পালন করাকেই সততা বলে বিবেচনা করা হয়। আমরা দেখি উভয় সম্প্রদায়ই সততা শেখান বলে দাবি করেন কিন্তু আত্মায় সততা না থাকলে শুধু অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে মানুষকে দক্ষতা শেখানো যেতে পারে, সততা নয়।

উভয় সম্প্রদায়ই উৎকৃষ্ট নাগরিক হওয়ার জন্য যা আবশ্যক সদগুণ, তারা সেই সদগুণের শিক্ষাদানের শিক্ষক হিসেবে নিজেদের দাবি করনে। এ বিষয়ে দার্শনিক গুরু সক্রেটিস বলেন, 'সদগুণ যদি শিক্ষাদান করা যেত তবে সদগুণের প্রতিভূ পেরিক্লিজও তাঁর পুত্রদের সদগুণ শিক্ষা দিতে সক্ষম হতেন, কিন্তু তা শিক্ষাদানযোগ্য নয় বলেই দেশের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিবৃন্দও যে সদগুণের অধিকারী, তা তারা অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে পারেন না।'[৩৩] বাস্তবেও আমরা দেখি অনেক কলামিষ্ট ও স্পিকার যারা সততা বা সদগুণ নিয়ে চমৎকার বলেন বা লিখেন কিন্তু তাদের নিজ সন্তানেরা পর্যন্ত তা ধারণ করতে পারছেনা। মূলত সততা বা সদগুণ যাই হোক না কেন অন্তর্নিহিত ভাবে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে থাকলে তবেই কেবল একজন দার্শনিক শিক্ষক তা বের করে আনতে পারেন। এ বিষয়ে বলা যেতে পারে, ধাত্রী হিসেবে একজন ধাত্রী যেমন করে প্রসবকালে সন্তান ভূমিষ্ট হতে প্রসূতিকে সাহায্য করেন, ঠিক তেমনই করে; একজন প্রকৃত শিক্ষক ধাত্রীর মতো অন্তর্নির্হিতভাবে কারো মধ্যে সততা বা সদগুণ থাকলে তা বের করে আনতে পারেন।

সক্রেটিস শিক্ষা দিতেন মূলত নৈতিকতা; তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিক্ষার কাজে যুক্ত হতেন। কোনো দর্শনীর বিনিময়ে তিনি শিক্ষা দিতেন না। আর জ্ঞান-শিক্ষা কোনো গ্রহণ-প্রদানের বিষয়ও ছিল না। তা ছিল জ্ঞানকে জাগ্রত করার ব্যাপার। কারণ, জ্ঞান হলো মূলত অনুস্মরণ। যিনি শিক্ষক তিনি মূলত তার শিক্ষকের-অঙ্গীকার থেকে, দর্শনের অঙ্গীকার থেকেই শিক্ষার সাথে যুক্ত

হন। আমরা 'জবানবন্দি'-তে শুনতে পাই: "আমি যে আমার নিজের সমস্ত কাজকর্ম অবহেলা করলাম, এই সমস্ত বছরগুলোতে আমার পরিবারকেও হেলাফেলা করলাম, সারাক্ষণ আপনাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করলাম, পিতা বা বড় ভাইয়ের মতো আপনাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে আপনাদের সদগুণ অর্জনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মাথা ঘামালাম- তাকে কি স্বাভাবিক মনুষ্য-প্রকৃতিজাত বলে ধরা যায়? অবশ্য, তাতে যদি আমার কোনো লাভ হতো, যদি সেই শিক্ষাদানের বিনিময়ে আমি কোনো অর্থ পেতাম, তাহলে না হয় আমার আচরণের অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু আপনারা তো নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, যারা আমার বিরুদ্ধে নির্লজ্জের মতো ঐসব অভিযোগ তুলেছে, তারা এমন কোনো সাক্ষী উপস্থিত করার সাহস দেখাতে পারেনি যে বলবে আমি তার কাছ থেকে একবার হলেও অর্থ গ্রহণ করেছি বা চেয়েছি। কিন্তু আমি যে সত্য বলছি তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারি-তার সাক্ষী হলো আমার দারিদ্র।"[৩৪]

সোফিস্টদের শিক্ষাদানের সূচনার পূর্বে 'সদগুণকে শিক্ষাদানযোগ্য' বলে ভাবা হতো না। তারাই তাকে শিক্ষাদানযোগ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যার বিশ্বজনীন সত্যতা অনস্বীকার্য। এটা যদি শিক্ষাদানযোগ্য না হতো তবে প্রতিষ্ঠানিকভাবে নৈতিকতা শিক্ষার সকল প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে পড়তো। অবশ্য সক্রেটিসও পরবর্তীতে স্বীকার করেছিলেন এটা শিক্ষাদানযোগ্য।[৩৫]

শিক্ষার বিনিময়ে দর্শনী গ্রহণের বিষয়টিকে সততা হিসেবে দেখতেন না সক্রেটিস। তিনি মনে করতেন এটি সুবিধাভোগীদের জন্য অধিকতর সুবিধা তৈরী করে দিত, যারা সুবিধাবঞ্চিত তাদের জন্য পিছিয়ে পড়ার কারণ ঘটাত। সক্রেটিসের ক্ষেত্রে দর্শনী গ্রহণ না করার পক্ষে আরো কারণ ছিল। তিনি মনে করতেন, সোফিস্টগণ "অর্থ গ্রহণ করে তাঁরা নিজেদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন; যারাই তাদের মূল্য দিত তাদের সাথেই আলাপ-আলোচনা করতে বাধ্য ছিলেন তারা অথচ তিনি যাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন তাদের সঙ্গ বেছে নেওয়ার জন্য তিনি ছিলেন স্বাধীন"।[৩৬] সক্রেটিসের কথার রেশ ধরে ফিলিস্তিনি মার্কিন তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিজীবী এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর, 'Orientalism'- গ্রন্থে বলেন, 'বুদ্ধিজীবী এমন একজন ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট বার্তা, একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও একটি সুচিন্তিত মতামত জনগণের সামনে তুলে ধরেন। কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাকে সত্য প্রকাশ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না'।[৩৭]

বর্তমান সময়ে আমরা অনেক বুদ্ধিজীবীদেরই দেখি যারা তীক্ষ্ম মেধাবী, যিনি প্রকৃত সত্য জানেন কিন্তু তা তুলে ধরেন না। এর কারণ হচ্ছে কেউ যখন প্রিপেইড বুদ্ধিজীবী হিসেবে কোন বিষয় সম্পর্কে বলতে বা লিখতে যায় তখন তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও কোন পক্ষের হয়ে লিখতে হয় বা বলতে হয়। মূলত অর্থের বিনিময়ে বা সুবিধার বিনিময়ে বিক্রি হওয়া এসকল বুদ্ধিজীবীদের কোন স্বাধীনতা থাকেনা, তারা পক্ষাবলম্বন করতে বাধ্য হয় কেননা তারা দলীয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজেদের ইতোমধ্যে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। এরা নিজেদের ভূল কখনো স্বীকারই করতে চান না কেননা প্রিপেইড বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় কোন একটা মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে। অথচ জ্ঞানগুরু সক্রেটিসও কেউ তাঁর ভূল ধরিয়ে দিলে আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি বলতেন, 'আদতে কোনো বিষয়ে আমার প্রস্তাব খণ্ডিত হলেই আমি

বেশি উপকৃত বোধ করি- অন্যকে বড় ধরনের মন্দ থেকে মুক্ত করার বদলে নিজে তা থেকে মুক্ত হওয়াই অধিকতর লাভ'।[৩৮]

আমরা সক্রেটিসের ধারায় প্রভাবিত হই বলেই সোফিস্ট ও হাল আমলের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অর্থ বা সুবিধার বিনিময়ে শিক্ষা প্রদানকে খাটো করে দেখি। তবে অর্থ বা সুবিধার বিনিময়ে হলেও তারা যে সমাজের নানা ক্ষেত্রে কোনই ভূমিকা রাখতে পারেন না তেমন নয়। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, আর তার প্রচার-প্রসারে তারাও ভূমিকা রাখেন। রোগ নিরাময়ের জন্য আমরা ডাক্তারকে অর্থ প্রদান করি কেননা তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্দিষ্ট রোগ ধরে তার প্রতিকারের জন্য ঔষধ সেবন করতে বলেন। তেমনি সদগুণ, বাগ্মীতা, সততা, কূটতর্ক শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রকৃত অর্থে কেউ যদি শিক্ষা লাভে আগ্রহীর নির্দিষ্ট ভুল ধরে অর্থের বিনিময়ে হলেও শিক্ষা প্রদান করতে পারেন তবে তা নিন্দনীয় নয়। সমাজ নির্মানের ক্ষেত্রে, সমাজের সমস্যা নিরসনে, মানুষকে দক্ষ করার ক্ষেত্রে এবং সমাজকে বুদ্ধির প্রাধান্যে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে টকশো, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, লেখালেখি, বক্তৃতা ও বাগ্মিতার ক্ষমতা অর্জন যে বেশ ভূমিকা রাখে তা অনস্বীকার্য। এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই সোফিস্টদের মতোই আধুনিক এসব বুদ্ধিজীবীদের কদর এত বেশি। তবে বুদ্ধিজীবীদের সক্রেটীয় ধারায় চলায়ই উত্তম। কোনো সুবিধা, লোভ-লালসা, পদ-পদবি তাকে মোহাবিষ্ট করতে পারবে না। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জন্য যা কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক তার জন্য তিনি স্বত:প্রবৃত্ত হয়েই শিক্ষা প্রদান করেন। যথার্থ বুদ্ধিজীবী তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে পক্ষপাতমুক্ত তেতো সত্য প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন না, তাঁর লক্ষ্যই তাকে প্রকৃত জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে সমাজকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখানো। শিক্ষা ও জ্ঞানদানের বিনিময়ে সক্রেটিসের মতো মহান দার্শনিক শিক্ষক যে ধারা চালু করেছিলেন মূলত এটাই হওয়া উচিত একজন যথার্থ বুদ্ধিজীবীর জন্য আদর্শ। এর ব্যত্যয় হলে সেক্ষেত্রে কাউকে বুদ্ধিজীবী নয়, বরং পেশাজীবী শিক্ষাদাতা বলা যেতে পারে।

শেষকথা

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা বলতে পারি সোফিস্ট ও হাল আমলের বুদ্ধিজীবীরা যুক্তিতর্কে, গণবক্তৃতায়, কূটকৌশলে লোকজনকে প্রশিক্ষিত করে তোলে আর সক্রেটীয় ধারার দার্শনিকের মন প্রশিক্ষিত হয় সৎ, উত্তম জীবন যাপনে, 'বিকাশ, ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বাধীনতায়', 'মনের সততায়', সর্বোপরি 'সামগ্রিক চিন্তায়'। সক্রেটীয় ধারার একজন বুদ্ধিজীবী জ্ঞান বা বুদ্ধিকে সত্য-ন্যায়-মঙ্গল-সুন্দর-আদর্শ শিক্ষা দেয়ার প্রধান হাতিয়ার মনে করেন। আর সোফিস্টীয় ধারার একজন পেশাজীবী শিক্ষাদাতা জ্ঞান বা বুদ্ধিকে কেবল অর্থ লাভের বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে তোষামোদের হাতিয়ার মনে করেন। ফরাসি দার্শনিক জুলিয়ান বেন্দা তাঁর 'The Treason of the Intellectuals'- গ্রন্থে বলেন, 'প্রকৃত বুদ্ধিজীবী তারাই যারা জাগতিক লাভের উর্ধ্বে উঠে নি:স্বার্থ এবং আপোষহীন জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত থাকেন। সত্য উচ্চারণে তারা থাকেন নির্ভীক, এমনকি সত্য প্রকাশের জন্য প্রাণ সংশয়ের মতো ঝুঁকি নিতেও তারা দ্বিধা করেন না বরং জাতির সংকটে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন'।[৩৯] একজন দর্শনানুরাগী বা প্রজ্ঞানুরাগী হিসেবে প্লেটো ও

সক্রেটিসের দর্শন আমাদের প্রভাবিত করবে নাকি সোফিস্টীয় ধারার পেশাজীবী শিক্ষা আমাদের প্রভাবিত করবে উপরোক্ত প্রবন্ধটি পাঠে তা সহজেই অনুমেয়।

তথ্যনির্দেশ

১. প্রফেসর মোহাম্মদ নুরনবী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.১১১-১১২।

২. আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, *প্লেটো, প্রোতাগোরাস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা. ২০১৫, পৃ.২০।

৩. Noburu Notomi, *The Unity of Plato's Sophist; 'Between the Sophist and the Philosopher*, Cambridge University Press, 2007, p. 25.

৪. W.K.C. Guthrie, *A History of Greek Philosophy (VoL. III),* Cambridge, 1969, p. 35.

৫. Guthrie, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

৬. প্রফেসর মোহাম্মদ নুরনবী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ.১১৩।

৭. বিশেষ সাক্ষাৎকার: আবুল কাশেম ফজলুল হক, প্রথম আলো, ৪ জুলাই, ২০২১।

৮. কারো লেখা বা বলার পেছনে যদি নিজের পদ লাভের কোন উদ্দেশ্য থাকে বা গোষ্ঠীকে খুশি রাখার উদ্দেশ্য থাকে তবে সেটাও এক ধরনের বিনিময় যার উপযোগিতা অর্থের থেকেও বেশী। আজকালকার অধিকাংশ লেখক বা বক্তার মধ্যে এ প্রবণতা লক্ষণীয়।

৯. 'পেইড বুদ্ধিজীবী' বা '*ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী*' লেখককে আগে থেকেই বলে দেয়া হয় কোন পক্ষ নিয়ে লিখতে হবে। সে অর্থের বিনিময়ে বা পদ-পদবীর আশায় সে মোতাবেক লিখে থাকে।

১০. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, সফিস্ট*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৩৬।

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮২।

১২. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।*

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২।

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫।

১৫. মোহাম্মদ নুরনবী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪-১১৫।

১৬. আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, *প্লেটো, থিয়াইতিতাস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ,ঢাকা, ২০১৮, পৃ.২৩।

১৭. মোহাম্মদ নুরনবী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪।

১৮. Bertrand, Russell, *A History of Western Philosophy,* Routledge, London,1945, page-91

১৯. আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, *প্লেটো, প্রোতাগোরাস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা. ২০১৫, পৃ.১২।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২১. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, গর্জিয়াস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.১৭।

২২. মোহাম্মদ নুরনবী, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

২৪. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, সফিস্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৪।

২৫. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, গর্জিয়াস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০।

২৬. বিস্তারিত জানতে- অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খানের সাক্ষাৎকার, বুদ্ধিজীবী কাদের বলা হয়? এদের কাজ কী "তোষামোদজীবী", যমুনা টিভি, ২০১৯, ডিসেম্বর, ১৪।

২৭. আমাদের সময় ও তার প্রেক্ষিত বোঝার জন্য নোয়াম চমস্কি যেভাবে সাহায্য করেন/মুহাম্মদ গোলাম সারওয়ার/শুদ্ধস্বর/অক্টোবর ১, ২০১৯।

২৮. আহমদ ছফা, *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস*, মুক্তধারা, ১৯৭২।

২৯. হারুন উর রশীদ স্বপন/বুদ্ধিজীবী বনাম দলীয় বুদ্ধিজীবী/ডয়চেভেলে/০৯.০৭.২০২১।

৩০. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, গর্জিয়াস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.১৭।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৩৩. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, প্রোতাগোরাস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ.১২।

৩৪. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, সক্রেটিসের জবানবন্দি*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৮১।

৩৫. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, সফিস্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২।

৩৬. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, প্রোতাগোরাস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ.২৭।

৩৭. https://www.dw.com/bn/কে-বুদ্ধিজীবী অথবা শাহনাজ মুন্নী/কে বুদ্ধিজীবী/ডয়চে ভেলে/সংবাদ ভাষ্য/০৯.০৭.২০২১ইং।

৩৮. আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, *প্লেটো, গর্জিয়াস*, পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ.৬৭।

৩৯. দৈনিক যুগান্তর/ 'বুদ্ধিজীবী' বস্তুবিচার / জাহেদ সরওয়ার/ ৩০ নভেম্বর, ২০১৮।